Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-X, Issue-II, January2022, Page No.01-09
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

অনুসন্ধিৎসু গবেষকের দৃষ্টিতে নাট্যকর্মী রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত

ড. মৃদুল ঘোষ
সহকারী অধ্যাপক, কোচবিহার কলেজ, কোচবিহার

Abstract:

Rudraprasad Sengupta is an undisputed genius in the world of Bengali drama practice and acting. His acting career began from his college life. Although he is a professor of English by profession, he is also a playwright. Rudraprasad Sengupta came to Cooch Behar with Nandikar's production 'Ei Shar Ei Samoy' organized by 'Roop-Katha' drama group after a gap of two decades. In this connection I gained the good fortune to be close to him several times. This closeness will forever be written in the pages of my memory. On his initiative, many drama workshop was held at school college in Cooch Behar district. He has been closely associated with 'Nandikar' since its inception in 1960. At the age of eighty-six still, this renowned playwright is surviving as a problem solver for many people. From 1986 to 2013, under his strong leadership, 'Nandikar' was able to show outstanding achievements in staging many new and old plays. Although he got Sangeet Natak Academy and Bangabibhushan award, he is an ordinary playwright. While he is communist in political ideology, in the end he wanted to live with theater. So he planned the first 'Theater in Education'. He has been acclaimed on many stages outside the state and country. Being at the top of the theater troupe, he always observed all classes of directors, actors and actresses. His long life has shown the direction of innovation in the field of Bengali drama, acting and production. The next generation may be excited to know Rudraprasad Sengupta. The main objective of this research paper is the description of how a short acquaintance with a drama personality can get a permanent position in the mind.

***Key Words:** **Rudraprasad, Playwright, 'Nandikar', Acquaintance, Personality**.*

বাংলা নাট্য চর্চা তথা অভিনয় জগতের এক অবিসংবাদী প্রতিভা রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নাট্যকর্মীর সঙ্গে আমার পরিচিতি ঘটেছিল অনেকটা দেরিতে। কারণ অবশ্য নাট্যশিল্পের কলা কুশলীদের প্রতি অনাগ্রহ নয়; বরং অন্তরের চক্ষু আবৃত থাকার সুবাদে। বাংলা সাহিত্য পাঠের সূচনাকালে নাটক ও নাট্যমঞ্চ সম্পর্কে প্রকৃত উৎসাহ দাতার অভাবে দৃষ্টির উন্মীলন ঘটেনি। অন্তরে চাপা না থাকা ক্ষুধা যেমন কোনো না কোনো পথ ধরে প্রকটিত হয়, তেমনি আমার নাট্য পিপাসা যথারথ পথ খুঁজে পেয়েছিল একটু অন্যভাবে। কোচবিহারের ইউনিভার্সিটি বি. টি. অ্যান্ড ইভিনিং কলেজে যোগদানের অল্পদিনের মধ্যে পরিচয় ঘটে অধ্যাপক উত্তীয় দে'র সঙ্গে। পাশাপাশি তার জোরালো আহ্বান আমাকে নাট্যাভিনয় ও

প্রযোজনা বিষয়ে নতুন চেতনায় প্রাণিত করে। খুব অল্প সময়ের চেষ্টায় তিনি নাট্যদল গড়ে কোচবিহারের নাট্যচর্চাকে সমৃদ্ধির পথে একধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। এপর্যন্ত যতটা জেনেছি 'নান্দীকার' বিশ শতকের সাতের দশকে প্রথম থিয়েটার নিয়ে কোচবিহারে এসেছিলেন। মাঝের দুটি দশক জুড়ে এই দলের নাটক কোচবিহারে খুব বেশি অভিনীত হয়নি। এরপর পুনরায় ২০০০ সালের ১৬ মে 'রূপ-কথা' নাট্যগোষ্ঠীর আয়োজনে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত নান্দীকারের প্রযোজনা 'এই শহর এই সময়' নিয়ে কোচবিহারে আসেন। ২০০১ সালের ২৬ থেকে ২৯ মে কোচবিহারের রবীন্দ্রভবন মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় 'রূপ-কথা নান্দীকার নাট্য উৎসব ২০০১'। নাট্য উৎসবের প্রথম দিন নান্দীকারের আর্থিক সহযোগিতায় 'রূপ-কথা'র কলাকুশলীদের অভিনয়ে মঞ্চস্থ হয়েছে 'মজার দেশের গল্প' নাটক। এই উৎসবের ২৮ ও ২৯ মে নান্দীকার প্রযোজিত নাটক 'গোত্রহীন' এবং 'নগরকীর্তন' সফলভাবে মঞ্চস্থ হয়েছিল। এর পর থেকে প্রায় দীর্ঘ ৭ বৎসর একইভাবে রূপ-কথা নান্দীকার গাঁটছড়া বেঁধে চলেছিল মফঃস্বলের থিয়েটারগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে। রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত এরকম একমাত্র নাট্য ব্যক্তিত্ব — যিনি গ্রাম শহরে একই গতিতে নাট্যক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করবার মানসিকতা নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন।

তাঁর এই বিশেষ প্রয়াসের কারণে আমার মত একজন সাধারণ নব-নাট্য উৎসুক মানুষের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত নামক প্রখ্যাত নাট্যকর্মীর। এরপর বার বার তিনি কোচবিহারে এসেছেন। কোচবিহারের ইন্দিরাদেবী হাই স্কুল, জেনকিন্স স্কুল, সুনীতি একাডেমী, বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ, ঠাকুর পঞ্চানন মহিলা মহাবিদ্যালয় সহ বেশ কয়কটি স্কুল-কলেজে নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালার মাধ্যমে নাটককে সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। আমি তখন জেনকিন্স স্কুলে শিক্ষকতা করছি। 'রূপ-কথা'র কর্ণধার উত্তীয় দে জানালেন আমার স্কুলের কচি কাঁচা ছেলেদের নিয়ে সাত দিনের নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করতে চায় 'নান্দীকার' এর নাট্য কর্মীরা। এরকম কর্মশালাগুলির মধ্যে থেকে ভবিষ্যতের নাট্যকর্মী বা নাট্য উৎসুক মানুষ খুঁজে নাট্যচর্চা তথা রঙ্গমঞ্চের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন ছিল এই কাজের অন্যতম লক্ষ্য। সেই সুযোগে জেনকিন্স স্কুলের প্রধান শিক্ষক নির্মলেন্দু দেব মহাশয়ের অনুমতিক্রমে ২০০৭ সালের আগস্ট মাসে সপ্তাহব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আমার স্কুলের কচিকাঁচা ছাত্রদের উৎসাহ দেখে সেদিন মুগ্ধ হয়েছিলাম। রুদ্রপ্রসাদের মতো ব্যক্তিত্ব মাত্র ঘণ্টাখানেকের পরিচয়ে ছেলেদের কত আপন করে নিয়েছিল তা কোনো দিন ভুলতে পারব না। অনবদ্য তাঁর বাচন ভঙ্গী। চোখের শাসনে শিশু থেকে প্রবীণ সকলে মিতবাক। এই অসীম প্রতিভার অধিকারী মানুষটির সঙ্গে অল্প সময়ের সান্নিধ্য চিরকাল আমার স্মৃতির পাতায় লেখা থাকবে।

প্রায় প্রত্যেক বছর শীতকালে কোচবিহারের নাট্য উৎসবে 'নান্দীকার'এর উপস্থিতি কোচবিহারবাসীকে মুগ্ধ করেছে। কলকাতা নামক মহানগরীর কেন্দ্রআকর্ষণী এই নাট্যদলের নাটক দেখবার জন্য একদল মানুষ অপেক্ষা করে থাকত সারাবছর। এই অপেক্ষার ভরকেন্দ্র কিন্তু ছিলেন কর্ণধার রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত, গৌতম হালদার, সোহিনী সেনগুপ্তরা তখন নান্দীকারের কর্ণধারের সঙ্গে দেশ বিদেশের মঞ্চ দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। সেই সুবাদে আমি ভারতীয় নাট্যশালার এক প্রবল প্রতাপান্বিত ব্যক্তিত্বের পাশে বসে নিজেদের দলের ও অন্য দলের নাটক দেখবার যোগ্যতা অর্জন করেছিলাম। সুযোগ পেয়েছিলাম রঙ্গমঞ্চকে নতুনভাবে অনুভব করবার। পরবর্তীকালে তাঁর জীবন সম্পর্কিত নানা তথ্য যেভাবে জেনেছি তার সঙ্গে আমার বোধি ও চেতনার বিশেষ মিল খোঁজার দরকার হয়নি; কারণ মানুষটিকে আমি যে একেবারে কাছে থেকে দেখেছি বেশ কয়েকটি বছর। আমি নিজের কানে রুদ্রপ্রসাদের ভাবগম্ভীর সংলাপ শুনেছি।

নাটকের শুরুতে এই নাট্যকর্মীর মঞ্চে প্রবেশ ভঙ্গী ও অতি সংক্ষিপ্ত কথায় থিয়েটারি আবহ তৈরি করে দেবার অসম্ভব ক্ষমতা দেখে আমার মতো প্রেক্ষাগৃহের সমস্ত দর্শক মুগ্ধ হয়েছে বারবার। কোচবিহারে কলকাতা ও অন্যান্য জেলা শহরের অনেক দলের নাটক দেখেছি কিন্তু 'নান্দীকার' এক অন্য মাত্রা, অন্য ধারা, অন্য চেতনার বাহক। তার সৃজনশীলতায় রয়েছে মুক্তির আনন্দ, বাধা বন্ধন হীন হৃদয়ের আবেগ, অনেক ক্ষেত্রে রূঢ় বাস্তবতার স্পষ্ট প্রকাশ। সেই আবেগের বন্যায় ভাসতে পারেন সমাজের যে কোনো স্তরের, যে কোনো শ্রেণির মানুষ; উপলব্ধি করতে পারেন এক টান টান উত্তেজনা। নাটক দেখার শেষে পেতে পারেন নির্মল আনন্দ ও উপভোগের চরম তৃপ্তি। নাট্যক্ষেত্রে প্রবল প্রতাপান্বিত নাট্যকার, নাট্য রচয়িতা, নির্দেশক, পরিচালক সহ বহু বিষয়ের স্রষ্টা মানুষটি এভাবে দেশ বিদেশের সর্বত্র মানুষের মনযোগ আকর্ষণের দাবিদার হতে পেরেছেন। একজন নাট্য অনুরাগী তথা নাটকের শিক্ষার্থী লিখেছেন, "রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত এমন এক বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী যাঁকে নিয়ে আমার মত সামান্য একজনের কলম ধরা সত্যি ধৃষ্টতা। তিনি কী নন? একজন শিক্ষক, একজন নাট্যকার, পরিচালক, অভিনেতা, ভালো ক্রিকেটারও বটে। আবার অসম্ভব ভালো একজন বক্তাও — এমনই আরও কত ! এবং সর্বোপরি একজন মুশকিল আসান।"[১] এই কথাগুলি আমার মতো একজন সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রেও সমানভাবে সত্য। দীর্ঘ ছিয়াশি বছরের জীবৎকালে হয়তো প্রথিতযশা নাট্যকর্মী এরকম কয়েক হাজার মানুষের 'মুশকিল আসান' হয়ে বেঁচে রয়েছেন।

অনুভূতির কথা বলতে গিয়ে কেবল নিজের অভিব্যক্তির মধ্যে থেমে থাকলে চলে না। তাই নাট্যকার রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের অতীতের দিকে একটু ফিরে তাকালে বোধ হয় তাঁর জীবন-ভাবনার দিক খানিকটা স্পষ্ট হয়। মানুষ রুদ্রপ্রসাদের জন্ম অবিভক্ত বঙ্গদেশের কলকাতা শহরে (১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জানুয়ারি); আর নাট্যকর্মী রুদ্রপ্রসাদের খ্যাতি-প্রতিপত্তি ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে প্রাচ্য পাশ্চাত্যের বহু দেশে। তাঁর পূর্ব পুরুষের বাসস্থান ছিল বরিশাল জেলার মাহিলাড়া গ্রামে। গ্রামটি কীর্তনখোলা নদীর তীরে অবস্থিত। ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কলকাতার হাতিবাগানে বোমা পড়ছিল। হয়তো সেই বোমার হাত থেকে রক্ষা পেতে পরিবারের বড়দের সঙ্গে বেশ কিছুদিন বরিশালে আত্মীয়দের বাড়িতে কাটিয়েছিলেন। সাত বছর বয়সে কেরোসিন লণ্ঠনের আলোয় বই পড়া, শচীনদেব বর্মণের গান শোনার অনুভূতির কথা 'ছিয়াশির যুবক'এর মনে এখনো সজীব। ছ'মাস বয়সে পিতাকে হারিয়েছেন। মায়ের মৃত্যু ঘটেছে শৈশবে। পাঁচ ভাই তিন বোনের সর্বকনিষ্ঠ বলে দাদা দিদিদের প্রশ্রয় ও আশ্রয়ে বিভিন্ন শিক্ষায়তনে শিক্ষালাভ করেছেন। সে সময় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় লাগাম পরানোর রীতি বিশেষ ছিল না। বাংলা ও বাংলার বাইরে কয়েকটি স্কুলে পড়াশুনা করে শেষপর্যন্ত 'দমদম কুমার আশুতোষ ইনস্টিটিউট' থেকে ১৯৫১ তে ফার্স্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করেছেন। কলেজের পড়াশুনাতে গতানুগতিক না হয়ে তিনি অনেক ক'টি কলেজে ভর্তি ও বিদায় শেষে মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ থেকে আই.এস.সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে স্কটিশ চার্চ কলেজে ইংরেজী অনার্সে ভর্তি হলেন। বাড়ির প্রায় সকলে ইংরেজী সাহিত্য চর্চায় অনুরাগী এবং ইংরেজীর শিক্ষক ছিলেন বলে বিষয় হিসেবে তিনিও ইংরেজীকে বেছে নিয়েছিলেন। অগ্রজ প্রতিম অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে ইংরেজী নিয়ে মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজে ভর্তি হতে বললে পড়াশুনার গুণমানের বিচারে স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়বেন বলে স্থির করেছিলেন। মনে রাখা দরকার স্কুল জীবন থেকে কলেজের দিনগুলিতে তিনি ফুটবল, টেনিস, ক্রিকেট সমস্ত খেলায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজে পড়বার সময়ে কমিউনিস্ট মতাদর্শে প্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁর জীবন কথা সম্পর্কে একটি পত্রিকায় লেখা হয়েছে, "তিনি একাধারে ছাত্রনেতা, ক্রিকেটের

ক্যাপ্টেন, টেবিল টেনিস খেলেন, কলেজ ম্যাগাজিনের এডিটর, ছাত্র ফেডারেশন তথা ইউনিয়নের লিডার, আবার কলেজে নাটক হবে এমন পরিস্থিতিতে অধ্যাপক সুশীল মুখার্জীর কাছে অডিশন দিয়ে নাটকে পাওনাদারের পার্ট জোগাড় করলেন।"[২] এভাবে প্রতিভাত হতে থাকল রুদ্রপ্রসাদের বর্ণময় জীবনের সঙ্গে থিয়েটারের যোগাযোগ। আসলে নিজেকে সর্বদা কাজের মধ্যে জড়িয়ে রাখতে প্রয়াসী ছিলেন এই কর্মোদ্যমী মানুষটি।

খেলেধূলা, রাজনীতি, সাহিত্য, সাংস্কৃতিক কাজকর্ম ও সঙ্গীতের প্রতি গভীর অনুরাগ তাঁর ভবিষ্যতের পথ নির্ধারণ করে দিতে অনেকখানি সহায়তা করেছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. পড়বার সময় সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট নেতা পূরণ চাঁদ যোশীর দ্বারা প্রাণিত হয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্দান্ত ছাত্র নেতা রুদ্রপ্রসাদ নির্বাচিত হয়েছিলেন ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক। কমিউনিস্ট পার্টির অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে তিনি আসীন হয়েছিলেন। কিন্তু আজীবন মার্ক্সিজমে বিশ্বাসী মানুষটি নানা বিষয়ে পার্টির নেতাদের সঙ্গে মতান্তরের কারণে রাজনীতির জগৎ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলেন। ইউনিভার্সিটিতে পড়বার সময়ে 'An Inspector Calls'এর কাহিনি অবলম্বনে 'থানা থেকে আসছি' নাটকে ইনস্পেক্টর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। ১৯৬০ সালের ২৯ জুন অগ্রজ অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ মণীন্দ্র কলেজের অনেকে মিলে 'নান্দীকার' নাট্যগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করেন। পরের বছর অজিতেশের আহ্বানে একজন সাধারণ নাট্যকর্মী হিসেবে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত এই নাট্যদলে যোগ দেন। পাশাপাশি ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যপক হিসেবে কলেজে পড়ানো শুরু করেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগে এবং দিল্লির ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা শিক্ষায়তনে আমন্ত্রিত অধ্যাপক হিসেবে পড়িয়েছেন। বহু সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, নান্দীকারে তিনি এসেছিলেন সামাজিক কাজে সাহায্য করার মতো থিয়েটারকে সাহায্য করতে। তাঁর ভাষায় 'থিয়েটারকে বাইরে থেকে প্যালা দিতে'। তিনি সদস্য না হয়েও নাট্যদলের ম্যানেজারি বা তাত্ত্বিক গোছের সমস্ত কাজ করে দেবার দায়িত্ব পালন করতেন।[৩] এরপর কখনো কখনো অন্যের অনুপস্থিতিতে কিছু কাজ চালাবার মতো চরিত্রে অভিনয় করেছেন। ১৯৬৫ তে প্রথম নান্দীকারে একটি ছোট চরিত্রে অভিনয় করেন। এই পাঁচটি বছর তিনি নান্দীকার দলকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সমস্ত ধরনের কাজ করে গেছেন নিঃস্বার্থে নির্দ্বিধায়।

পরের বছর থেকে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত নির্দেশকের পছন্দ অনুসারে নাটকের মূল চরিত্রে অভিনয় করলেন। ১৯৬৬ তে প্রথম নান্দীকার এর 'শের আফগান' নাটকে বলরাম মুখার্জী চরিত্রে তাঁর পূর্ণাঙ্গ অভিনেতারূপে আত্মপ্রকাশ। বলা চলে তাঁর প্রকৃত অভিনয় জীবনের যথার্থ সূচনা ঘটেছিল এই সময়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ১৯৬৫'র প্রথম দিকে বিভাস চক্রবর্তী, অশোক মুখোপাধ্যায়, মায়া ঘোষ, চিন্ময় রায় প্রমুখরা দল ছেড়ে দিয়ে 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ' তৈরি করলেন। পুরোনোদের দলে আটকে রাখবার সব চেষ্টা সেদিন ব্যর্থ হয়েছিল। সে সময়কার ভাবনায় রুদ্রবাবু লিখেছেন, "আমি থিয়েটারের একজন সোলজার। একজন অল টাইম অড জব ম্যান। আমাকে যা পার্ট দেবে তাই করব। না দিলে করব না। কী এসে যায়।"[৪] আসলে 'নান্দীকার' থেকেই তাঁর পূর্ণাঙ্গ থিয়েটারকর্মী জীবনের সূচনা হল। কিছু বাধ্যবাধকতার কারণে তাঁকে এগিয়ে যেতে হয়েছিল নাট্য নির্দেশনা, নাটক রচনা, অভিনয় শিক্ষা থেকে সার্বিক থিয়েটারের উন্নয়নের কাজে। জীবনে নাট্যকার হিসেবে তাকে প্রতিষ্ঠা পেতে হবে এরকম ধারণা কখনো তিনি পোষণ করেননি। নাটক রচনা যে খুব সহজ কাজ নয় তা তিনি অনেকবার বলেছেন। সেকারণে তিনি বহু বিদেশি নাটকের অনুবাদ করে সেগুলিকে স্বদেশের প্রেক্ষাপটে অভিনয় করবার ব্যবস্থা করেছিলেন। থিয়েটার কর্মী

হিসেবে সারা জীবন তিনি নিজেকে সংযত রেখে গেছেন নাট্যদলকে টিকিয়ে রাখবার স্বার্থে। নিজের বয়স বাড়তে থাকলে নতুন প্রজন্মের তরুণ তরুণীদের মতামত গ্রহণ করে অভিনয় থেকে তাদের নির্দেশনার পথে অনুপ্রাণিত করেছেন। একটি নাট্য সংকলন গ্রন্থের ভূমিকা থেকে তার প্রমাণ দেবার চেষ্টা করব। গ্রন্থের ভূমিকা অংশ লিখতে গিয়ে এক তরুণ বলছেন, "চলতি রীতিতে কোন সংকলন বা সাধারণ গ্রন্থের সামনের কয়েকটি পাতায় ভূমিকা তাঁরাই লিখে থাকেন যাঁদের বয়স, অভিজ্ঞতা এবং প্রজ্ঞা নির্দিষ্ট গ্রন্থে সংকলিত বিষয়ে নতুন মাত্রা সংযোগে সক্ষম। এ ক্ষেত্রে রুদ্রদার সিদ্ধান্ত ক্রমে সে নিয়ম ভাঙ্গা হচ্ছে আর সাধারণ স্বভাবে যেহেতু অপরিণত কনিষ্ঠরা বয়স্কদের অধিকার অর্জনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে— হয়তো সেই বোধেই বেআইনিভাবে আমি ঢুকে পড়লাম।"[৫] এই কথাগুলি নাট্যকার অভিনেতা নাট্যকর্মী রুদ্রপ্রসাদের ক্ষেত্রে দুশো শতাংশ সত্যি। তিনি সব সময়ে চাইতেন নতুনদের অভিনয় ক্ষেত্রে জায়গা করে দিতে। তরুণ প্রজন্মের ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়ে নাটকে কাজে লাগাতে। তাদের মধ্যে থেকে সমাজের জন্য নাটকের মাধ্যমে ভালো কিছু করতে। এখানেই তাঁর অনন্যতা।

১৯৬৫ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত নান্দীকার গোষ্ঠীর সকলের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একের পর এক প্রযোজনা সম্পূর্ণ করেছেন। নাট্য নির্দেশনা কিংবা থিয়েটার কর্মীদের জন্য অনুদান ভাতার ব্যবস্থা কিংবা নতুন প্রোজেক্ট আনতে সদা ব্যস্ত ছিলেন। শুধু নান্দীকার নয়, কলকাতার গ্রুপ থিয়েটারের দলগুলি যাতে সরকারি অর্থ সাহায্য ঠিকভাবে পায় সে ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন। ১৯৬১ সালে 'নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র' নাটকের অভিনয় যেভাবে 'নান্দীকার'কে পরিচিত দিয়েছিল তেমনি ১৯৭৫ সালে 'আন্তিগোনে'তে রুদ্রপ্রসাদের অভিনয় নাট্যজগতে তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দিল। এরপর ১৯৭৭ এর ১০ মার্চ 'ফুটবল' নাটকের প্রথম শো অভিনীত হল। সে সময়ে অজিতেশ বন্দোপাধ্যায় 'ফুটবল'এর অভিনয় করাতে সম্মত ছিলেন না। এই নাটকের 'কালিদা' চরিত্রে রুদ্রপ্রসাদের অভিনয় বাংলার নাট্যপ্রিয় মানুষদের মুগ্ধ করেছিল। হঠাৎ অজিতেশ সহ কয়েকজনের সঙ্গে দলের মানুষদের অল্পবিস্তর মতপার্থক্য ও মনোমালিন্য থেকে তারা ভিন্ন মত পোষণ করতে থাকেন। এরকম বহু ঘটনা পরম্পরার শেষে ১৯৭৭ এর সেপ্টেম্বরে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় পাকাপাকিভাবে নান্দীকার ছেড়ে চলে গেলেন। সে সময় সর্বজনপ্রিয় রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের মতো প্রবল কর্মনিষ্ঠ মানুষ বেশ কিছুদিন একাকিত্বের অনুভবে দিন কাটিয়েছিলেন। একটি সাক্ষাৎকারে রুদ্রবাবু জানিয়েছেন, "আমার জায়গা থেকে বা অজিতেশের জায়গা থেকে পরবর্তীকালে কতগুলো জিনিস বুঝতে পারা যায়। আমি ওর মাপের শিল্পী নই, ওর মাপের ডিরেক্টর নই, ও-ই এটার জন্মদাতা, ওই আমাকে থিয়েটারে এনেছিল। আই হ্যাভ ডিপেন্ট রেসপেক্ট ফর হিম অ্যাজ এ ডিরেক্টর অ্যান্ড গ্রেট অ্যাক্টর, ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট ইন বেঙ্গলি স্টেজ। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা হয়ে যাচ্ছিল। সেগুলো ম্যানিফেস্টেড হচ্ছিল ছোটো ছোটো কারণে।"[৬] এই বিচ্ছেদকে তিনি বিরোধ না বলে বরং দুদিকে যাওয়া বলতে চেয়েছেন। আসলে দল তৈরি, রক্ষা, পরিচালনা পদ্ধতি সম্পর্কে দুজনের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন ছিল বলে এই বিচ্ছেদ আটকানো সম্ভব হয়নি।

১৯৭৮ সাল থেকে নান্দীকারের সমস্ত দায় দায়িত্ব এসে পরে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত'র উপরে। ১৯৭৮ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে 'নান্দীকার' বহু নতুন ও পুরোনো নাটকের মঞ্চায়নে অসামান্য কৃতিত্ব দেখাতে সক্ষম হল। প্রথমা পত্নী কেয়া চক্রবর্তীর মৃত্যুর পর ১৯৮০ সালে দ্বিতীয় পত্নী স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত দলে যোগ দিলেন। আটের দশকে গৌতম হালদার, দেবশঙ্কর হালদার, শুভাশিস গাঙ্গুলী সহ একঝাঁক তরুণ অভিনেতা অভিনেত্রী যোগ দেবার ফলে 'নান্দীকার'এর শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। দীর্ঘ পথ

চলতে চলতে বহুবার অভিনীত হল 'খড়ির গণ্ডী', 'মুদ্রারাক্ষস', 'ব্যতিক্রম', 'হননমেরু', 'মাননীয় বিচারকমণ্ডলী', 'নীলা', 'তুঘলক', 'গ্যালিলিওর জীবন', 'শেষ সাক্ষাৎকার', 'ফেরিওয়ালার মৃত্যু', 'গোত্রহীন', 'নগরকীর্তন', 'ব্রেখ্‌টের খোঁজে', 'এই শহর এই সময়', 'সোজনবাদিয়ার ঘাট', 'যাহা চাই', 'নানা রঙের দিন', 'অজ্ঞাতবাস', 'নাচনী'র মতো আরও অনেক যুগান্তকারী নাটক। এই নাটকগুলির বেশিরভাগ ছিল বিদেশি নাটক থেকে অনুবাদ। শুধু কলকাতা নয়, কলকাতার বাইরে বহু জেলায় এবং ভারতের অনেক রাজ্যে অভিনীত হতে থাকল এই নাটকগুলি। দীর্ঘ পথ চলার মধ্যে বহু নাটকে যেমন তিনি অভিনয় করলেন তেমনি খুঁজে খুঁজে অভিনেতা অভিনেত্রী তৈরি করতে সচেষ্ট থাকলেন নিরন্তর। ১৯৮০ 'র পর থেকে তিনি থিয়েটার চর্চাকে সমাজের শিক্ষাঙ্গন থেকে সংশোধনাগার সর্বস্তরে পৌঁছে দেবার সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। থিয়েটারের অঙ্গনে এনেছিলেন পথশিশু, বস্তিবাসী মানুষ, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু, যুবক থেকে যৌনকর্মীদের। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে নাটককে সামাজিক স্তরে পৌঁছে দেবার পথিকৃৎ বলা যেতে পারে নাট্যকর্মী রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তকে। থিয়েটার এর দিন-রাতের কর্মী মানুষটি ১৯৮০ সালে ভারত সরকারের সঙ্গীত নাটক একাদেমি থেকে শ্রেষ্ঠ জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন। ২০১২ সালে থিয়েটারে অবদানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে বঙ্গবিভূষণ পুরস্কার প্রদান করেন। এভাবে পূর্ণতার এক শিখর স্পর্শ করে থাকলেও নিজেকে মনে করেন এক জন সাধারণ নাট্যকর্মী। কিন্তু এত কিছু করবার পরেও তিনি পশ্চিমবঙ্গ তথা বাংলার নাট্য চর্চার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত রয়েছেন। ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কলকাতায় নাট্যচর্চার ভবিষ্যতের কথায় জানিয়েছেন, "To be straight forward, I'm not that excited about the future of theatre in Kolkata. I don't find much 'inspiring works' -- not only in theatre, but also in other art forms. The problem is not only subcontinental, but rather global. In this materialistic society, theatre activists have to compromise at every step. It's a hostile environment for nurturing art."[৭]

১৯৮৪ সাল। নান্দীকার সে বার পঁচিশ বছরে পা দিচ্ছে। জন্মদিন পালনের পরিকল্পনা থেকে নান্দীকারের উদ্যোগে শুরু হল জাতীয় নাট্যমেলা। দলের জন্ম জুন মাসে হলেও এই নাট্য মেলা প্রতিবছর ডিসেম্বরে আয়োজিত হয়। দেখতে দেখতে ৩৭ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। এই নাট্যমেলার কারণে কলকাতার নাট্যপ্রেমি মানুষ দেশ বিদেশের নাটক দেখবার সুযোগ পাচ্ছে। বলা চলে এই উৎসবের জন্য পার্শ্ববর্তী অনেক রাজ্যের মানুষ অপেক্ষা করে থাকেন। এভাবে একই গতিতে নান্দীকার এখনো নিয়মিত সারা ভারতে কাজ করে চলেছে। গত কয়েক দশকে এই থিয়েটার গ্রুপটি ভারত, বাংলাদেশ, জার্মানি, সুইডেন, যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বেশ কয়েকটি দেশে নাটক অভিনয় ও বিদেশের রঙ্গমঞ্চগুলিকে প্রত্যক্ষ করেছে। এই উৎসবের নেপথ্যে থাকেন অক্লান্ত পরিশ্রমী যে মানুষটি তাঁর নাম রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। থিয়েটার সম্পর্কে নিজের অভিব্যক্তির কথায় তিনি বলেন, "আমি নিজেকে থিয়েটারের ক্রিয়েটিভ লোক মনে করি না। তার ফলে আমি সব সময়ে চেষ্টা করি যা আছে আমাদের ভাণ্ডারে, নান্দীকারে, বা একটু রিমোটলি বাংলা থিয়েটারের ভাণ্ডারে, সেটাকে আমি কীভাবে ভালো করে অর্গানাইজ করতে পারি। এটা সবসময় আমার মাথার মধ্যে কাজ করতে থাকে।"[৮] আসলে জীবনব্যাপী নাট্য প্রচেষ্টার মূলে থিয়েটারের প্রতি যে অনাদি অনন্ত ভালোবাসা জন্মেছে সেখান থেকে হাজার প্রতিবন্ধকাতার মধ্যেও সাফল্যের পথ সন্ধান করে চলেছেন তিনি।

নাট্যকার, পরিচালক, নির্দেশক ও সংগঠক রুদ্রপ্রসাদের জীবনের সঙ্গে, নাটকের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে স্ত্রী স্বাতীলেখা ও সোহিনী সেনগুপ্ত। তাঁদের যেমন সুযোগ দিয়েছেন তেমনি দলের যোগ্য শিল্পীদের প্রতিভার স্ফূরণে সদা সচেষ্ট থেকেছেন। এক বৈচিত্র্যময় নাট্যকর্মীকে সঙ্গে পাবার অভিজ্ঞতার কথাকে সম্পূর্ণতা দিতে উপরোক্ত বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। পুনরায় নিজের দু-একটি অভিজ্ঞতার কথা বলে শেষ করব। বিশ শতকের নয়ের দশক থেকে নান্দীকার মফঃস্বল শহরের নাট্যচর্চাকে প্রাধান্য দেবার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। সেই পদক্ষেপের সুফল এসে পৌঁছেছিল প্রান্তিক শহর কোচবিহারে। ২০০১ সালে কোচবিহারের রূপ-কথা ও নান্দীকারের যৌথ প্রচেষ্টায় ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে নাট্য কর্মশালাগুলি চালিয়ে যেতে থাকে। তাদেরই অনুপ্রেরণায় 'রূপ-কথা' কোচবিহারের যৌনকর্মীদের নিয়ে প্রশিক্ষণের ভিত্তিতে মঞ্চস্থ করেছিল 'নষ্ট মেয়ের কথা' নাটক। আসলে কেন্দ্রাভিগ শক্তির মতো নান্দীকার তখন বাংলা তথা ভারতবর্ষের বুকে থিয়েটারকে সামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত করেছিল। রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তই প্রথম 'থিয়েটার ইন এডুকেশন'এর পরিকল্পনা করেছিলেন। আবার নাটককে দর্শক টানার উপায় হিসেবে নানা সঙ্গীত বা উত্তেজক দৃশ্য সংযোজনার কথা ভেবেছিলেন। সচেতন ভাবেই তিনি দর্শক রুচির কথা মাথায় রেখে শিল্পকর্মকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। নাটক যেহেতু একা লেখক বা কবির মতো শুধু রচয়িতা মনোগ্রাহী করলে চলে না সেই ভাবনা তিনি সবসময় মাথায় রেখে চলতেন। একদিন কোচবিহারের রবীন্দ্রভবনে একটি নাট্যদলের নাটক দেখছিলাম। নাটকের একটি দৃশ্যে একটু অশ্লীলতার ছাপ লক্ষ্য করে বলেছিলাম, স্যার নাটকটা কেমন যাত্রাপালার মতো হয়ে গেল না! এর উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "দর্শককে তুমি সব সময়ে যা দিতে চাইছ তা হয়তো সকলে সমানভাবে নেবে না। সেকারণে নির্দেশককে সব ধরনের দর্শকের কথা মাথায় রেখে চলতে হয়। উদাহরণ দিয়ে বলেছিলেন J OKE Y জাঙ্গিয়ার কোম্পানি যখন বিজ্ঞাপন তৈরি করে তখন কেবল জাঙ্গিয়াটা কতটা ভালো বিজ্ঞাপনে তা ফুটিয়ে তোলেন না। সেই জাঙিয়া পরে দাঁড়িয়ে থাকা পুরুষ বা নারীটিকে কতটা সুন্দর দেখাচ্ছে সেটাও বিবেচ্য বিষয়। নাটকও ঠিক তাই। কেউ আসবে কুশীলবদের দেখতে। কেউ আসবে আলোর ঝলকানি দেখতে। কেউ আসবে আবসর যাপন বা চিত্ত বিনোদনের জন্য। আবার কেউবা আসবে বন্ধু জোর করে দুটো টিকিট দিয়েছে বলে সময় কাটাতে।"[৯] আসলে সমাজের অনেক মানুষ নাটকের কাহিনি উপভোগের চাইতে আনুষঙ্গিক দিকগুলো বেশি করে দেখবে। এভাবে নাট্যদলগুলোকে বেঁচে থাকতে হয়; অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হয়। এরকম আরও বহু কথা তিনি বিভিন্ন সময়ে বলতেন তার চেনা পরিচিত গণ্ডীর মানুষদের কাছে।

একবার রবীন্দ্রভবন মঞ্চের পেছন দিকে সাজ ঘরের কর্মীদের জীবন সংগ্রামের কথা শুনিয়েছিলেন। মঞ্চে দাঁড়িয়ে নটী বিনোদিনীর প্রসঙ্গ টেনে বলেছিলেন, প্রতি সন্ধ্যায় যে মেয়েটির রংমাখা মুখ মঞ্চে দেখে সমাজের জ্ঞানী গুণী ভদ্র শিষ্ট বিত্তবান মানুষেরা করতালিতে প্রেক্ষাগৃহ ভরিয়ে তোলে, সেই মেয়েটির জীবন সংগ্রামের পাশে কিন্তু এই শিষ্ট মানুষেরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় না। এটা রঙ্গমঞ্চের কর্মীদের জীবনে একটা বড় ট্র্যাজেডি। একথা বলে বোঝাতে চেয়েছিলেন নাট্যকর্মী অভিনেতাদের জীবন সংগ্রামের কথা। বার বার এরকম বহু যৌক্তিক কথা বলে তিনি ভারতবর্ষের বহু মঞ্চে প্রশংসা পেয়েছেন, রঙ্গকর্মীদের প্রেরণার শক্তি হয়েছে। বিদেশের বহু মঞ্চে এরকম কথা চিরকাল প্রশংসিত করেছে তাঁকে। একটি ঘটনার কথা বলে প্রসঙ্গ শেষ করতে চাই। রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত'র মতো মনযোগী নাট্য শ্রোতা বা দর্শক খুব কমই তৈরি হয়। একথা বলবার কারণ এটাই, যে মফঃস্বলের থিয়েটার দলের পরিচালক, নির্দেশক, অভিনেতা, অভিনেত্রীরা থিয়েটারকে কীভাবে প্রযোজিত করছে সেটা তিনি খুব মনোযোগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করতেন।

সম্ভবত ২০০৭ সালের আগস্ট মাসের এক সন্ধ্যায় কোচবিহার রবীন্দ্রভবন মঞ্চে 'রূপকথা' নাট্যগোষ্ঠীর 'ঘুমন্ত পুরীর রাজকন্যা' নাটকটি অভিনীত হল। আমি আর রুদ্রপ্রসাদ বাবু প্রেক্ষাগৃহের মাঝামাঝি এক কোণে বসে রয়েছি। রঙ্গালয়ের অনেক আসনই খালি পড়ে আছে। নাট্য বিরতির পূর্বের দৃশ্য শেষ হল। দর্শকেরা প্রায় নীরব। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাধ্যমতো শক্তিতে শব্দ করে নিজে করতালি দিতে শুরু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে অনেক দর্শক করতালি দিতে শুরু করলে কলা কুশলীদের মনে আনন্দের সঞ্চার ঘটেছিল হয়তো। আসলে অভিনীত নাটকটি ততখানি শক্তিশালী ও দর্শক মনোরঞ্জক ছিল না। বিরতির সময়ে জানিয়েছিলেন, "মৃদুল, তোমাদের দলের নাটকের অভিনয়ে যদি তুমি করতালি না দাও, তবে অন্য দর্শকদের করতালি আশা কর কী করে ! প্রযোজনা যাই হোক না কেন নিজের দলের অভিনয়কালে করতালি দেবার কাজটিও দলের লোকদেরই করতে হয়।"[১০] আসলে সেদিন আমি খুব গভীরভাবে ভেবেছিলাম এবং বুঝেছিলাম তিনি কত বড় মাপের সংগঠক। প্রসঙ্গত বলে রাখি আমি 'রূপ-কথা' নাট্যদলের একজন সাধারণ পৃষ্ঠপোষক বা কর্মী ছিলাম অল্প কিছুদিন। রুদ্রবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় সূত্রটিও এর সঙ্গে অন্বিত। সে কারণে সেদিন যেভাবে যা কিছু প্রত্যক্ষ করেছিলাম, সময়ান্তরে সেই বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এক অসাধারণ নাট্য ব্যক্তিত্বের সম্পর্কে কিছু সাধারণ কথা বলবার চেষ্টা করলাম।

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত সম্পর্কে এত কথা বলবার কী প্রয়োজন ছিল এক অনুসন্ধিৎসু গবেষকের চোখে দেখা মানুষের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে? আসলে একজন মানুষের সঙ্গে ক্ষণিকের বা কয়েক দিনের সাক্ষাৎ কীভাবে মনের মণিকোঠায় চিরন্তন স্থান লাভ করতে পারে সেই অনুভূতির কথা ব্যক্ত করবার জন্য ব্যক্তি রুদ্রপ্রসাদ বা থিয়েটার কর্মী রুদ্রপ্রসাদের জীবন কর্মের এই বিস্তৃত পরিচয় দিতে হল। দেশের প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল কিংবা মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে সম্মাননা গ্রহণ অথবা সাক্ষাতের মুহূর্ত মানুষ যেমন মনের ও চোখের ক্যামেরায় বন্দী করে রাখে — নাট্যকার রুদ্রপ্রসাদের পাশে বসে নাটক দেখা ও কয়েকদিনের সাক্ষাৎ দর্শন আমার কাছে তেমনি এক সম্প্রতি অতীতকালের স্মরণীয় ঘটনা। সেই ঘটনার কথা স্মরণ করে যখন ফিরে যাই সেই পুরোনো দিনগুলিতে, তখন অন্তরে এক অনাবিল আনন্দের উদয় ঘটে। সেই আনন্দের অংশ ভাগ করে দিতেই আজ এই প্রবন্ধ রচনা। ইতোপূর্বে এই থিয়েটার কর্মীকে নিয়ে বহু মানুষ হয়তো নানা ধরনের লেখালেখি করেছেন। কিন্তু এই প্রবন্ধে নাট্যকারের জীবনের ঘটনা ব্যাতিত সমস্ত কিছুই অন্তরের অনুভব ও বাস্তবতা থেকে লিখতে চেষ্টা করেছি। আমার কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতার স্মরণিকা পাঠ করে একজন প্রকৃত নাটকের পৃষ্ঠপোষক তথা নাট্য পিপাসু রঙ্গকর্মী মানুষকে, বাংলা তথা ভারতীয় নাট্য জগতের এক বিশেষ ব্যক্তিত্বকে নতুনভাবে অনুধাবণে করতে পারব আমরা। স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত ২০২১ সালের ১৬ জুন চলে গেলেন না ফেরার দেশে। হিমালয়ের মতো ধ্যান গম্ভীর মূর্তি নিয়ে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত এখনো নান্দীকারের সঙ্গে নাট্যকর্মী হিসেবে সম্পৃক্ত রয়েছেন। তাঁর দীর্ঘজীবন বাংলা নাট্যসাহিত্য, অভিনয় ও প্রযোজনার ক্ষেত্রে নতুনত্বের দিশা দেখিয়েছে। তাঁর অবর্তমানে হয়তো আগামী প্রজন্মের মানুষেরা রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তকে জানবার উৎসাহ উদ্দীপনায় মেতে উঠবে। সেদিক থেকে এই লেখা খানিকটা হলেও উৎসাহ জাগাবে বলে আমি আশা রাখি।

তথ্যসূত্র :

১. 'মুশকিল আসান রুদ্রপ্রসাদ', সীমা মুখোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, নাটক সমগ্র-১, সপ্তর্ষি প্রকাশন, ৪৪এ চক্রবর্তী লেন, শ্রীরামপুর, হুগলী, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর : ২০০২, পৃ. ৩৪০

২. প্রসঙ্গ রুদ্রপ্রসাদ, 'অন্যকথা'(প্রথম খণ্ড), দীপক মিত্র ও সিদ্ধার্থ সেন (সম্পাদক), দশম বার্ষিক সংখ্যা ১৪২২, পৃ. ১৭

৩. https://archive.org/details/dni.ncaa.NSS-AC_63A_63B_NSS_DIGN_15-AC

৪. প্রসঙ্গ রুদ্রপ্রসাদ, 'অন্যকথা'(প্রথম খণ্ড), দীপক মিত্র ও সিদ্ধার্থ সেন (সম্পাদক), দশম বার্ষিক সংখ্যা ১৪২২, পৃ. ১৯

৫. রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, নান্দীকারের ত্রয়ী, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা - ৯, পৃ. ১

৬. প্রসঙ্গ রুদ্রপ্রসাদ, 'অন্যকথা'(প্রথম খণ্ড), দীপক মিত্র ও সিদ্ধার্থ সেন (সম্পাদক), দশম বার্ষিক সংখ্যা ১৪২২, পৃ. ২১

৭. Conversation with Ersad Kamol and Rudraprasad sengupta, The Daily star, Dhaka, Bangladesh, November 9, 2007

৮. সুমন মুখোপাধ্যায়কে দেওয়া সাক্ষাৎকার, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, নাটক সমগ্র-১, সপ্তর্ষি প্রকাশন, ৪৪এ চক্রবর্তী লেন, শ্রীরামপুর, হুগলী, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর : ২০০২, পৃ. ৩৬২

৯. প্রাবন্ধিকের সঙ্গে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের একান্ত আলাপ চারিতার সময়ে বলা কিছু কথা, ডিসেম্বর ২০০৭

১০. কোচবিহার রবীন্দ্রভবন প্রেক্ষাগৃহে নাটক দেখবার সময়ে প্রাবন্ধিকের সঙ্গে রুদ্রবাবুর মত বিনিময়, আগস্ট ২০০৮